গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ৩০ সংখ্যা | ৬ - ১২ মার্চ ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

মহান স্ট্যালিন স্মরণে

জন্ম ঃ ১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮
মৃত্যু ঃ ৫ মার্চ ১৯৫৩

"বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পতাকাকে একেবারে বিসর্জন দিয়েছে। ... তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতার আর কোনও অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তির অধিকার আছে শুধু পুঁজির মালিকদের জন্য। আর অন্য সব মানুষকে দেখা হয় মানবরূপী কাঁচামাল হিসাবে, যারা শুধু শোষণের উপযুক্ত।"

জোসেফ স্ট্যালিন

রাজ্যের কৃষকরাও রাস্তায়

কলকাতায় রামলীলা পার্কের কৃষক সমাবেশের একাংশ

২ মার্চ, কলকাতার রামলীলা পার্কে দুপুরের রোদ তখন বড়ই প্রখর। বাঁকুড়ার ঠুটাশোলের চাষি ঘরের নারী পুরুষ মিলিয়ে ১০/১২ জন গভীর আগ্রহে শুনছেন নেতাদের কথা। পাশেই পশ্চিম বর্ধমানের ইছাপুর গ্রামের সুকু মুর্মু ছোট্ট মেয়ের আব্দার সামলেও কান খাড়া রেখেছেন কী বলেছেন নেতারা সে দিকে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপের পানচাষিরাও হাজির, আছেন পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েক হাজার কৃষক। এসেছেন তাঁরা কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের কানে তাঁদের বাঁচার দাবি পৌঁছে দিতে। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে দুদিন ব্যাপী 'কিষাণ মার্চে'র দীর্ঘ পথ পেরিয়ে তাঁরা এসেছিলেন, অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠনের (এআইকেকেএমএস)-এর ডাকে ১-২ মার্চ 'কিষান মার্চে' অংশ নিয়ে।

স্বাধীনতার পর বাহাত্তরটা বছর পার হয়ে গেছে, অথচ আজও সেচের জলের জন্য কৃষককে তাকিয়ে থাকতে হয় আকাশের দিকে। প্রতি গ্রীষ্মে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, জঙ্গলমহল, বর্ধমানের হাজার হাজার একর জমি জলের অভাবে শুকোয়। এক বছর চাষ হলে তিন বছর খরা, সেচের কোনও ব্যবস্থাই আজও সরকার করেনি। আবার রাজ্যের বিস্তীর্ণ প্রান্ত বছর বছর বন্যায় ডুবে যায়, ফসল নষ্ট হয়। মরে কৃষক। দলে দলে গ্রাম ছেড়ে তারা কাজ খুঁজতে চলে যায় ভিন রাজ্যে, এমনকি ভিনদেশে পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ভোটের সময় বলেছিল, কৃষকের আয় তারা দ্বিগুণ করে দেবে। তার বদলে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট মালিকদের স্বার্থে নেওয়া কেন্দ্রীয় কৃষিনীতির জেরে আয়ের সব পথ হারিয়ে ফেলছে লক্ষ লক্ষ কৃষক। কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের কাজের সুযোগও ক্রমাগত কমিয়ে দিচ্ছে। সর্বস্বান্ত কৃষকের আত্মহত্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে এনআরসি-

আটের পাতায় দেখুন

জ্বলছে দিল্লি, মরছে মানুষ, নেতারা হিসেব কষছেন ভোটের

এ যেন অবিকল গুজরাট দাঙ্গার মডেল। ঠিক তেমনই আগে থেকে সংখ্যালঘু মানুষদের বাড়ি, দোকান চিহ্নিত করে রাখা, তারপর বেছে বেছে একই কায়দায় সেগুলিতে আগুন লাগানো, লুঠতরাজ চালানো। একই রকম ভাবে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে, কোথাও তাদের সহযোগিতায় তাণ্ডব চালানো। সেই একই রকম নীরবতা নরেন্দ্র মোদির। পার্থক্য শুধু, সেদিন তিনি ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী, আর এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। অমিত শাহ, যিনি এই গোটা কুকীর্তির মূল কারিগর, তিনি সেদিন ছিলেন গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আজ কেন্দ্রীয় সরকারের। গোটা দেশজুড়ে, এমনকি দেশের বাইরেও যখন এই একতরফা হত্যাকাণ্ডের, বর্বরতা, নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কার উঠছে, তখনও প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুজনের কারও মুখে একটিও কথা নেই। যেন কিছু হয়নি, কিংবা সবই স্বাভাবিক।

ভাবা যায়, ভারতের মতো একটা দেশের রাজধানী শহরে, প্রকাশ্য দিনের আলোয় দিনের পর দিন দুষ্কৃতীরা শাসক দলের নেতাদের নেতৃত্বে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে! পুলিশ পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়, প্রশাসন নীরব। তিন দিন পর প্রধানমন্ত্রী টুইট করলেন, যেন সকলে শান্তি বজায় রাখে। কাদের উদ্দেশে তাঁর এ বার্তা? কাদের দায়িত্ব শান্তি বজায় রাখা? দেশের সাধারণ মানুষের? তারা তো সব সময় শান্তির পক্ষে। কোথাও কোনও দিন সাধারণ

দিল্লি গণহত্যার নায়ক অমিত শাহর পশ্চিমবঙ্গ সফরের প্রতিবাদ জানিয়ে ১ মার্চ রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (সি)। ছবিতে তাঁর কুশপুতুলে অগ্নি সংযোগ করছেন দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী

মানুষ অশান্তি তৈরি করে? দিল্লির অশান্তি তো বাধিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দলের নেতারাই। তাঁদের নেতৃত্বে বাছাই করা দুষ্কৃতীরা। তারাই তো 'গোলি মারো শালোঁ কো' বলে দাপিয়ে

দুয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লি গণহত্যা প্রসঙ্গে
এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এক বিবৃতিতে বলেন, সাম্প্রদায়িক আক্রমণে উত্তর-পূর্ব দিল্লি যখন জ্বলছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি, দোকানপাট অবাধে লুঠতরাজের সংবাদ যখন ক্রমাগত আসছে, চলছে হত্যা, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হাসিমুখে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে আলিঙ্গন করে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছেন, রাজসিক খানাপিনায় ব্যস্ত আছেন। এজন্য তিনি এতটুকু সময় পাননি হত্যাকাণ্ড থামানোর কোনও আদেশ দিতে। এই জঘন্য ঘটনা দেশবাসীকে দেখতে হল! এ ঘটনা রোমের সম্রাট নিরোর চরম বিবেকহীন আচরণকেই মনে করিয়ে দেয়। বিপুল অর্থের প্রতিরক্ষা চুক্তির বিনিময়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নরেন্দ্র মোদিকে 'সৎ', 'ধার্মিক' এবং 'ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট' বলে দরাজ সার্টিফিকেট দেওয়ায় তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট। কিন্তু যে সব অসহায় মানুষ তাঁদের পিতা, সন্তান, ঘরবাড়ি কিংবা সম্পত্তি হারালেন তাঁদের সান্ত্বনা দেবে কে?

কারা এই ধ্বংসলীলার জন্য দায়ী তা বুঝতে কোনও

পাঁচের পাতায় দেখুন

ছাত্রদের ধিক্কার, ‘গো ব্যাক অমিত শাহ’

১ মার্চ বেলা ১২ টা নাগাদ কলকাতার সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কুশপুতুল পোড়ায় মধ্য কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা। গোটা চত্বর জুড়ে শোনা যায় বহু কণ্ঠের ধ্বনি, ‘ খুনি অমিত শাহ গো ব্যাক’। অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটি এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র সংগ্রাম কমিটি’র ডাকে এ দিন জ্যাকারিয়া স্ট্রিটে ছাত্রছাত্রীরা একত্রিত হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখে মহম্মদ জান স্কুলের ছাত্রী মারিয়া খাতুন, সিএমও স্কুলের ছাত্রী নাসরিন বানো, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অনন্যা নন্দী প্রমুখ। তার পর শুরু হয় মিছিল। যোগ দেন এলাকার বহু মানুষ। সেন্ট্রাল মেট্রোর কাছে পুলিশ তাঁদের রাস্তা আটকালে স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটির রাজ্য সম্পাদক সামসুল আলম সেখানে বলেন, ‘দিল্লি হত্যাকাণ্ডের খলনায়কদের আমরা ধিক্কার জানাই। নেতাজি, শরৎচন্দ্র, নজরুল, বিবেকানন্দের বাংলায় সাম্প্রদায়িকদের ঠাঁই নেই। অমিত শাহ গো ব্যাক।’

নেতারা হিসেব কষছেন ভোটের

একের পাতার পর

বেড়াচ্ছিল দাঙ্গার আগের কয়েক দিন থেকে। এ সব জেনেই তো প্রধানমন্ত্রীর এমন শান্তির বুলি!

কয়েক দিন ধরে জ্বলল রাজধানী। মৃতের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৪৬-এ পৌঁছেছে। হয়ত আরও বাড়বে। ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি তুলে গেরুয়া পতাকা হাতে নিয়ে, বন্দুক উঁচিয়ে তাণ্ডব চালাল আরএসএস-সংঘ বাহিনী। বাড়িঘর, দোকানপাট, স্কুল পর্যন্ত তছনছ করে দিল। চলল অবাধ লুটতরাজ। লাগানো হল আগুন। কালো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে যতই উঠতে লাগল ততই দুষ্কৃতীরা উল্লাসে স্লোগান তুলল “এক হি নারা এক হি নাম / জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম”। সাংবাদিকদের মাথায় লাঠি মারা হল। দুর্বৃত্তরা সাংবাদিকদের হুমকি দিয়ে বলেছে, ‘তোরা কোন ধর্মের আগে পরিচয়পত্র দেখা’। হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ‘ইয়ে হিন্দুয়োঁ কা লড়াই’। অতএব ছবি তোলা যাবে না।

দেশে কোনও সরকার আছে কি না, তার কোনও স্বরাষ্ট্র দপ্তর আছে কি না, তার কোনও মন্ত্রী আছে কি না, তাণ্ডবের কয়েক দিন দেশের মানুষ বুঝতেই পারল না। পুলিশের সামনেই দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালাল। পুলিশ কাউকে বাধা দিল না। বাস্তবে দুষ্কৃতীরা পুলিশকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করল। সরকারের সমর্থন না থাকলে পুলিশ এভাবে দুষ্কৃতীদের সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে? সব কিছু থেমে যাওয়ার পর এনআইএ প্রধান রাস্তায় বের হলেন। নিপীড়িত এলাকাগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে নির্বিকার চিত্তে তিনি বলে গেলেন, ‘যা হওয়ার হয়েছে, এখন থেকে আপনাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের’। একটা সরকারের, তার প্রশাসনের ভণ্ডামি কোথায় পৌঁছালে এমন কথা এত ঠাণ্ডা গলায় উচ্চারণ করা যায়! যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর হয় কথায় নয় কথায় অধ্যাপক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, সাধারণ মানুষ— যে কেউ সরকারের সমালোচনা করলেই তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দিয়ে জেলে ভরে দেয়, সেই স্বরাষ্ট্রদপ্তর দিনের পর দিন বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর, সাংসদ প্রবেশ ভার্মার মতো নেতারা চরম উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেওয়া সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করা দূরের কথা, তাঁদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের করল না। এমনকি বিচারপতি এস মুরলিধর যখন সরকারের এই অসভ্যতা, এই নষ্টামি আর সহ্য করতে না পেরে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দিলেন অবিলম্বে উস্কানিদাতাদের নামে অভিযোগ দায়ের করতে, অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে সরকার রাতারাতি তাঁকে বদলি করে দিল। দাঙ্গার পিছনে সরকারের হাত না থাকলে এসব ঘটতে পারে!

হত্যাকাণ্ড চলাকালীন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন পুলিশের কাছে ১৩ হাজার ২০০ ফোন গিয়েছিল আক্রমণ, গুলি, অগ্নিসংযোগের খবর দিয়ে। পুলিশ কোথাও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। দিল্লি পুলিশ এতখানি অপদার্থ, পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর এতখানি নিষ্কর্মা, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে? বিজেপি নেতা-কর্মীরাও কি তা মনে করেন? প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব থামাতে কি তাদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন? না, দেননি। বরং উল্টোটাই সত্য। সরকারের, স্বরাষ্ট্রদপ্তরের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ ছাড়া পুলিশ এ ভাবে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। এর পরেও কি বিজেপি সরকারকে একটা গণতান্ত্রিক, সভ্য সরকার বলা যায়? শুধুমাত্র সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে বলেই একটা শাসক দল শুধুমাত্র ধর্মের কারণে একাংশ মানুষের উপর এমন গণহত্যা চালাতে পারে? গণতন্ত্রের এত বড় অপব্যবহার দেশের মানুষ মেনে নেবে!

অমিত শাহ কলকাতায় এসে বক্তৃতা দিয়ে বাংলায় সরকার গড়বেন বলে দাব করে গেলেন। অথচ একবারও দিল্লি গণহত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন না। এই হত্যাকাণ্ডের পুরো দায় যে তাঁর তা একবারও স্বীকার করলেন না। তিনি সভা শেষ করে সোজা কালিমন্দিরে চলে গেলেন কি রক্তাক্ত হাতে পুজো সার্থক হবে মনে করে!

এই একতরফা হত্যাকাণ্ড আটকাতে তথাকথিত বিরোধী দলগুলি কী ভূমিকা পালন করল? সদ্য দিল্লির নির্বাচনে মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ায় চ্যাম্পিয়ান সেজেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁরই রাজ্যে আক্রান্ত মানুষগুলিকে রক্ষা করতে কী ভূমিকা পালন করলেন তিনি? সে ভূমিকা কি চরম কলঙ্কজনক নয়? জনগণের সমর্থনে সদ্যই নির্বাচিত হয়েছেন তিনি এবং তাঁর দলের আরও ৬২ জন বিধায়ক। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল কিংবা তাঁর দলের এইসব বিধায়কেরা কেউই পথে নামেননি, দাঁড়াননি অসহায় মানুষগুলিকে বাঁচাতে। দাঁড়াননি আক্রান্তদের পাশে। পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী রাজঘাটে গিয়ে ধরনার মস্করা করেছেন। যখন সাধারণ মানুষ প্রাণের তোয়াক্কা না করে ভিন্ন ধর্মের মানুষকে বাঁচাচ্ছেন দাঙ্গাবাজদের আক্রমণ থেকে তখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে পুলিশ না থাকার অজুহাত তুলেছেন। এই না নামাটাই কি কেজরিওয়াল সাহেবের নরম হিন্দুত্বের লাইন? তিনি নাকি দিল্লিবাসীর উন্নয়নের কাণ্ডারি? এ বার তিনি নিশ্চয় সেই উন্নয়নের ডালি নিয়ে হাজির হবেন সন্তানহারা, স্বামীহারা, সব হারা মানুষগুলির পাশে? বার্তা দেবেন তাঁদের সঙ্গে থাকার? ধিক এই ভ্রষ্টাচারী রাজনীতিকে!

একই রকমভাবে তৃণমূল নেত্রী, যিনি নিজেকে সংখ্যালঘুদের ত্রাতা বলে প্রচার করতে ভালবাসেন, লোকসভার ভোট এলেই বিরোধী ঐক্যের ডাক দেন, তিনি কিন্তু দুর্গত মানুষগুলিকে বাঁচাতে তো কোনও ঐক্যের ডাক দিলেন না। পরিবর্তে পুরীর মন্দিরে ‘শান্তি’ কামনা করেই তাঁর দায়িত্ব সারলেন। এই সব নেতা-নেত্রীদের এই সব আচরণের পিছনে কি একমাত্র ভোটের হিসেবই কাজ করছে না?

কংগ্রেস নেত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়েছিলেন যাতে তিনি সরকারকে রাজধর্ম পালনের নির্দেশ দেন। তিনি কি বিশ্বাস করেন, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তেমন নির্দেশ দেবেন? তা হলে কেন গিয়েছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে? দেশবাসীর সাথে এই প্রতারণার কী প্রয়োজন ছিল! আসলে তিনি গিয়েছিলেন ভোটের হিসেব কষেই।

বাস্তবে ভোটবাজ এই দলগুলির কাছে দেশের মানুষের আশা করার কিছু নেই। মানুষ এদের কাছে এক-একটি ভোটের সংখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ হিসাবে কোনও মূল্য নেই। বিজেপি যেমন হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে, শোষিত মানুষের ঐক্যকে ভেঙে দিতে দাঙ্গা বাধায়, দাঙ্গা বাধাল, বিরোধী দলগুলির হিসেবও উল্টোদিক থেকে একই রকম। আদর্শগত ভাবে, নীতিগত ভাবে আজ পুরোপুরি দেউলিয়া এই দলগুলি। মানুষকে দেওয়ার এদের আর কিছু নেই— একমাত্র প্রতারণা ছাড়া। তাই মানুষকেই আজ এই দাঙ্গার রাজনীতির, ভোট সর্বস্ব রাজনীতির, ভণ্ডামির রাজনীতির পাল্টা জনগণের স্বার্থরক্ষার রাজনীতি গড়ে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। দাঙ্গার সময়ে মানুষের এই ভূমিকারই অজস্র উজ্জ্বল উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে দিল্লি জুড়ে। বিজেপি অনেক চেষ্টা করেও একে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় পরিণত করতে পারেনি। মানুষই মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে হিন্দু এবং মুসলমান সাধারণ মানুষ পরস্পরের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, সম্পত্তি রক্ষা করেছেন। সাধারণ মানুষের এই অটুট বিবেকই আজও বিজেপি-আরএসএস বাহিনীর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সামনে প্রধান বাধা। সরকারি নীতির ব্যর্থতার বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভকে বিপথে চালিত করতে বিভেদের রাজনীতিই বিজেপির হাতে একমাত্র অস্ত্র। তাই ভবিষ্যতে এমন হত্যাকাণ্ড আরও অনেক বার ঘটানোর চেষ্টা করবে বিজেপি-আরএসএস বাহিনী। সাধারণ মানুষকে নিজেদের স্বার্থেই সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় উভয় ধর্মের মানুষকে নিয়ে গড়ে তুলতে হবে সম্প্রীতি রক্ষা কমিটি। সমাজ মননের গভীরে বাসা বেঁধে থাকা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ নির্মূল করার জন্য গড়ে তুলতে হবে আদর্শগত সংগ্রাম।

প্রবীণ পার্টি দরদির জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুর শান্তি সংঘের প্রাক্তন সভাপতি ও সম্পাদক, সুন্দরবন অঞ্চল গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক, দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্য সদনের সভাপতি, হেরিটেজ কমিটি ফর গ্রেটার জয়নগরের সভাপতি ভূতনাথ মুখার্জী ২০ ফেব্রুয়ারি ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। ওই দিন রাতে তাঁর মরদেহ শান্তি সংঘ ভবন ঘুরে দলের জেলা দপ্তরে এলে সেখানে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

এস ইউ সি আই (সি) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত নেতা কমরেড শচীন ব্যানার্জী ’৩০-র দশকে স্বাধীনতা সংগ্রামের আবেগতপ্ত রক্তঝরা দিনে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন শান্তি সঙ্ঘ ও পরিতোষ পাবলিক লাইব্রেরি। লক্ষ্য ছিল দেহমনের উন্নত অধিকারী সত্যিকারের মানুষ তৈরি করা, সাহসে, তেজে, ত্যাগে, জ্ঞানে, উন্নত চরিত্রের ছাত্র-যুবকদের এমনভাবে তৈরি করা যাতে তারা স্বদেশের মুক্তি যজ্ঞে ব্রতী হতে পারে, আত্মাহুতি দিতে পারে— তারই কেন্দ্র হিসাবে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এই ক্লাব ও লাইব্রেরি। ব্রিটিশ শাসকরা এই ক্লাবের হাতে লেখা পত্রিকা শান্তি ও লাইব্রেরির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। একসময় এই শান্তি পত্রিকার সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন দলের আর একজন প্রয়াত নেতা সুবোধ ব্যানার্জী। শচীনবাবুর এই আদর্শ নিয়ে সেদিন ক্লাব করতে এগিয়ে এসেছিলেন বহু যুবক, যাঁদের শেষ প্রতিনিধি ভূতনাথবাবু প্রয়াত হলেন। শান্তি সংঘের উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশ বহু যুবক-যুবতীর জীবনধারা পরিবর্তন করে দেয়। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে যখন জয়নগরে দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্য সদন গড়ে ওঠে তখন ভূতনাথবাবু অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং আমৃত্যু তার পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রবীণ বয়সে যখন তিনি ক্লাবের পদাধিকারী ছিলেন না, তখনও বহু খুঁটিনাটি বিষয়েও তাঁর নজর থাকত শুধু নয়, ক্লাবের বর্তমান কর্মকর্তারা তাঁর মতামতের অপেক্ষায় থাকতেন। সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সদর্থক। জয়নগর সমেত দক্ষিণ ২৪ পরগণার সমৃদ্ধ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বর্তমান যুব সমাজের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ছোটদের উৎসাহ দিতেন যে কোনও ভাল কাজে। একটা সৃজনশীল মন কাজ করত। অথচ তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ। এলাকার অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কাজে সাহায্য করতেন নিঃশব্দে। মিটিং-এ মতপার্থক্য হলে ঐক্যমত করানোর চেষ্টা করতেন। অন্যদের বক্তব্য, তা জুনিয়রদের হলেও সঠিক মনে হলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। ছোট-বড় সকলের সঙ্গে মিশতে পারতেন। যে কোনও ব্যক্তির পছন্দ, যোগ্যতা, ক্ষমতা ইত্যাদি বুঝে তাকে সামাজিক কাজে যুক্ত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, যখন ভাল করে কথা বলতে পারছিলেন না, তখনও তিনি খোঁজ নিয়েছেন ক্লাবের কাজের বিষয়ে। গরিব মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অশেষ মমত্ববোধ। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন আন্তরিকতার সাথে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত সাংস্কৃতিক মানসম্পন্ন, উদারমনের মানুষ। দলের পদ ছিল কি না— এটা কোনও বিষয় ছিল না তাঁর কাছে। সূচনার যুগ থেকে তিনি ছিলেন দলের একান্ত আপনজন।

১ মার্চ জয়নগর রক্তাখাঁ পাড়া ময়দানে শান্তি সংঘের উদ্যোগে এক বিশাল স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে এলাকার বহু ক্লাব, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ভূতনাথ মুখার্জীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এবং মুখ্য আলোচক ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক ও শান্তি সংঘের আজীবন সদস্য অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর।

বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা বিপন্ন প্রশ্ন নিরপেক্ষতা নিয়েও

দিল্লি যখন জ্বলল, একের পর এক মৃত্যুর খবর এল, চলল অবাধ লুঠপাট, যখন হাজার হাজার মানুষ তাঁদের দোকান, সম্পত্তি এমনকি মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও হারাল, সেই সময় পুলিশ কী করল? হত্যালীলার গুজরাট মডেল অনুসরণ করে বিজেপি পরিচালিত পুলিশ বাহিনী হয় হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, না হয় সরাসরি নিধন যজ্ঞের অংশীদার হল। অসহায় মানুষ যখন আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে গিয়ে দাঙ্গাকারীদের বাধা পেয়ে পুলিশের সাহায্য চাইল, পুলিশ তখনও নির্বিকার থাকল! সেই দুঃসময়ে অসহায় মানুষ কোনও সুরাহা না পেয়ে যদি ছুটে যায় কোনও হাইকোর্টের বিচারপতির বাসভবনে, আকুল আবেদন জানায় আহতদের রক্ষা করতে পুলিশকে নির্দেশ দিন! দায়িত্ববোধ সম্পন্ন কোনও বিচারকের কর্তব্য কী? তিনি কি নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশকে নির্দেশ দেবেন না, এই মানুষগুলিকে রক্ষার দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে?

২০১৬ সালের ১২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন চার প্রবীণ বিচারপতি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন তুলেছিলেন, যে মামলাগুলির রায় সরকারের বিপক্ষে গেলে সরকার অস্বস্তিতে পড়তে পারে, সেগুলিকে 'বাছাই করা' বিচারপতিদের এজলাসে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কেন? সেদিন তাঁরা স্পষ্টই বলেছিলেন, সর্বোচ্চ আদালতের বিশ্বাসযোগ্যতাই ধাক্কা খাচ্ছে।

ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি এস মুরলীধর। ২৪ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে তাঁর বাসভবনে ছুটে যাওয়া আক্রান্ত মানুষের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠেছিলেন তিনি। রাত ১২টা থেকে ২টো পর্যন্ত শুনানি চালিয়ে তিনি পুলিশকে নির্দেশ দেন অবিলম্বে আহতদের উপযুক্ত হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তার পরের দিন হাইকোর্টের এজলাসে বসে তিনি কড়া নির্দেশ দেন, দিল্লিতে গণহত্যায় ইন্ধন দেওয়ার জন্য যারা বিদ্বেষ ছড়িয়েছে, সেই বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র, অনুরাগ ঠাকুর সহ সকলের বিরুদ্ধে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পুলিশকে এফআইআর দায়ের করতে হবে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, পুলিশ কি দিল্লি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর সক্রিয় হওয়ার সময় পাবে?

এর ফল কী দাঁড়িয়েছে তা দেশের মানুষের জানা। ২৫ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে বিচারপতি মুরলীধরের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল শাস্তিমূলক বদলির নির্দেশ। তাঁকে এমনভাবে পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টে বদলি করা হল যাতে সিনিয়রিটি থাকলেও তিনি কোনও দিন সেখানকার প্রধান বিচারপতি হতে না পারেন। রাষ্ট্রপতি ভবন ও সরকারের এই মাঝরাতের অতি সক্রিয়তা কাদের বাঁচাতে তা নিয়ে দেশের মানুষের কোনও সন্দেহ নেই। দেশ আরও দেখেছে বিচারপতি মুরলিধরের মতো নিরপেক্ষ ও দৃঢ় বিচারকের অনুপস্থিতিতে পুলিশ কার্যত দাঙ্গার মূল চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে এফআইআরের দায় থেকে রেহাই পেয়ে গেল। যাদের জন্য এই ভয়াবহ দাঙ্গায় প্রথম চারদিনেই ৪২ জনেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারালেন, শত শত মানুষ মারাত্মক আহত হলেন, সেই বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নাকি পরিবেশই নেই! পুলিশের এই ছেঁদো যুক্তিকেই মান্যতা দিয়ে তাদের একমাস দেরি করার সুযোগ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮.০২.২০২০)। বিশিষ্ট আইনজীবী দুষ্মন্ত দাভে বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম সুপারিশ করলেও যে ভাষায় কোনও সময় না দিয়ে তাঁকে সরে যেতে বাধ্য করেছে সরকার তা বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। এর মধ্য দিয়ে দিল্লি দাঙ্গার পিছনে ইন্ধন দাতাদের বিরুদ্ধে সঠিক তদন্ত এড়িয়ে যাওয়ার পথ করে নিল সরকার (ইকনমিক টাইমস ২৮.০২.২০২০)।

ভারতে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা যে কতটা বিপন্ন তা এই ঘটনায় ফের প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। ঠিক এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন দিল্লি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এপি শাহ। তাঁর উদ্বেগ, সরকার এবং প্রশাসনের সাথে এক হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় বিচারব্যবস্থা। সম্প্রতি দিল্লিতে এল সি জৈন স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আদালতের আত্মসমীক্ষা করা দরকার'। কাশ্মীরে মানুষের অধিকার খর্বের প্রশ্নে, অযোধ্যা রায় এবং সিএএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের প্রথমিক পদক্ষেপ খুবই রক্ষণশীল। সুপ্রিম কোর্ট এমন ভাবে আচরণ করছে, যাতে তাকে সরকারের থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না' (আনন্দবাজার পত্রিকা ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০)। তাঁর বক্তব্য, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আসামের ডিটেনশন শিবিরে মাত্র ৯০০ জন কেন, 'এ কথা শোনার পরেও কি বিশ্বাস করা যায়, এই আদালত মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য?'(ওই)

এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টের তৃতীয় সিনিয়র বিচারপতি অরুণ মিশ্র সুপ্রিম কোর্ট আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্তুতিতে বলেন, 'আন্তর্জাতিকভাবে দূরদর্শী নেতা', 'যিনি বিশ্ব জুড়ে চিন্তা করেন, কাজ করেন দেশের জন্য', 'এমন এক বিশিষ্ট নরদেহধারী মানুষ' (ডিগনিফায়েড হিউম্যান একজিস্টেন্স), 'মহাপ্রতিভাধর' ইত্যাদি। এই 'অস্বাভাবিক' প্রশংসাকে সঠিক বলে মানতে পারেন নি সুপ্রিম কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনও। তারা স্পষ্ট বলেছে, বিচারপতি মিশ্রের এই প্রশংসা স্বাভাবিক সৌজন্যকে ছাপিয়ে গেছে। সংগঠনের বক্তব্য, বহু মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার বাদী বা বিবাদী পক্ষ হিসাবে সুপ্রিম কোর্টে লড়ে, সেখানে প্রশাসনের কর্তাদের প্রতি এমন ভক্তির প্রকাশ বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে টলিয়ে দেবে (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৬.০২.২০২০)।

ভারতে আজ মানুষের প্রতিবাদের অধিকার, ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার, বাকস্বাধীনতার অধিকারের মতো ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি দেশজুড়ে চলা সিএএ বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সরকারের দমন মূলক নীতি, প্রতিবাদকারীদের 'দেশদ্রোহী', 'পাকিস্তানের দালাল' বলে দাগিয়ে দেওয়ার কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ নেতা থেকে শাসক দলের সমস্ত স্তরের নেতা কর্মীরা নিযুক্ত। বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীই যে অশান্তি সৃষ্টিকারী, খোদ প্রধানমন্ত্রী পোশাক দেখেই তা চিহ্নিত করে ফেলছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহীন বাগের প্রতিবাদীদের কারেন্ট লাগিয়ে মারতে চাইছেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের একটি মন্তব্য। তিনি গুজরাটের একটি অনুষ্ঠানে বিরুদ্ধ মতের অধিকার রক্ষার কথা তুলে ধরে বলেন, 'বিরোধিতা হল গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ (সেফটি ভালভ)। বলেন, 'গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুর কণ্ঠরোধ করা যায় না।' 'বৈধ সরকার রাজনৈতিক বিরোধিতার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপায় না। বরং তাকে স্বাগত জানায়'। 'বাকস্বাধীনতা রক্ষা করাই রাষ্ট্রযন্ত্রের কাজ হওয়া উচিত। ভীতি ছড়িয়ে বাকস্বাধীনতার অধিকার হরণের চেষ্টা করা হলে রাষ্ট্রযন্ত্রের উচিত সেই চেষ্টার বিরোধিতা করা' (আনন্দবাজার পত্রিকা,১৬.০২.২০২০)। ওই একই দিনে সামনে আসে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি টিভি নালাভাদে এবং এমজি শেউলিকরের ডিভিশন বেঞ্চের রায়। তাঁরা বলেছেন, 'মনে রাখতে হবে আমরা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি। আমাদের সংবিধানে আইনের শাসনের কথা আছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের কথা নেই।' আরও বলেছেন, 'সিএএ-র মতো আইন তৈরি হলে মুসলিমদের মতো কোনও একটি সম্প্রদায়ের মানুষ ভাবতেই পারেন যে, ওই আইন তাঁদের স্বার্থবিরোধী। তাই ওই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। সেটা সেই সম্প্রদায়ের ধারণা বা বিশ্বাসের প্রশ্ন। তা নিয়ে আদালত মাথা ঘামাবে না।' বিচারপতিরা বলেছেন, কেউ সরকারের আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই তাঁকে 'বিশ্বাসঘাতক' বা 'দেশদ্রোহী' বলা যায় না। (এনডি টিভি, ১৫.০২.২০২০)।

কথাগুলি আজকের পরিস্থিতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর প্রতিফলন সামগ্রিকভাবে বিচার বিভাগের কাজে দেখা যাচ্ছে কি? বিচারবিভাগ যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারছে না এ কথা আজ আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

২০১৬ সালের ১২ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন চার প্রবীণ বিচারপতি জে চেলমেশ্বর, রঞ্জন গগৈ, মদন লোকুর এবং কুরিয়েন জোসেফ নজিরবিহীন এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, গণতন্ত্রের স্বার্থে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা রক্ষা অত্যন্ত জরুরি। তাঁরা মুখ খুলতে বাধ্য হচ্ছেন, না হলে দেশের মানুষ বলবে সকলেই তাদের বিবেক বিক্রি করে দিয়েছে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, যে মামলাগুলির রায় সরকারের বিপক্ষে গেলে সরকার অস্বস্তিতে পড়তে পারে, সেগুলিকে 'বাছাই করা' বিচারপতিদের এজলাসে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কেন? সেদিন তাঁরা স্পষ্টই বলেছিলেন, সর্বোচ্চ আদালতের বিশ্বাসযোগ্যতাই ধাক্কা খাচ্ছে। (হিন্দু বিজনেস লাইন, ১২.০১.১৮)।

অতি সাম্প্রতিক কালে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ নিয়ে আদালতের ভূমিকাতেও এই প্রশ্ন উঠেছে। সারা দেশে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ এই আইনের বিরুদ্ধে রাস্তায় রাত জাগছে, মায়েরা শিশুসন্তান কোলে শীতের রাতে খোলা মাঠের অবস্থানে যোগ দিচ্ছেন, দিল্লির খোলা মাঠের ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদী মায়ের কোল খালি করে শিশু ঢলে পড়ছে মৃত্যুর করাল গ্রাসে, তবু মা অনড়— ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকদের আলাদা করতে দেব না এই দাবিতে। ইতিমধ্যে ৩১ জন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এই আন্দোলনের উপর পুলিশের আক্রমণে। দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশ এবং বিজেপি-আরএসএস বাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে। উত্তরপ্রদেশের কবি ইমরান প্রতাপগড়িকে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ওই রাজ্যের পুলিশ। তাঁর অপরাধ তিনি সিএএ-র বিরুদ্ধে মোরাদাবাদে শান্তিপূর্ণভাবে ধরনার ডাক দিয়েছিলেন। সারা দেশেই সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব জোয়ার উঠেছে। অর্থাৎ এটাই এই মুহূর্তে দেশের মানুষের সামনে প্রধান সমস্যা হিসাবে উঠে এসেছে। অথচ এই পরিস্থিতিতে সিএএ সংক্রান্ত ১৪৪টিরও বেশি আবেদন জরুরি ভিত্তিতে শুনতে চায়নি সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি বলে দিয়েছেন, আগে শান্তি ফিরুক তারপর এই মামলা শোনা যাবে। প্রশ্ন উঠেছে কোনও চিকিৎসক কি বলতে পারেন, আগে রক্তপাত থামুক তারপর আমি রোগী দেখব? অথচ এই আদালতই টাটা সনসের মালিকানার প্রশ্নে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনালের রায়ের উপরে মাত্র কয়েক মিনিটে স্থগিতাদেশ দেওয়ার নজির রেখেছে।

দিল্লিতে জামিয়ার ছাত্রদের উপর পুলিশি নির্যাতনের প্রতিকার চেয়ে ছাত্ররা সুপ্রিম কোর্টে গেল তাদের কথা আদালত শুনতে রাজি হয়নি। অন্যদিকে একই সময়ে দিল্লি জুড়ে জননিরাপত্তা আইন (পিএসএ) জারি করে মানুষের প্রতিবাদের অধিকার, গ্রেপ্তার হলে ন্যায় বিচারের অধিকার, এমনকি জীবনের অধিকার সরকার কেড়ে নিলে কার্যত সুপ্রিম কোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ তাকেই সমর্থন করে বলেছে 'তারা সরকারের হাত পা বেঁধে দিতে পারে না।'। জনগণের হাত বাঁধার সময় আদালত তা বলতে পারল না! (চলবে)

কী পেয়েছি দাঙ্গা থেকে, কী দিয়েছে দাঙ্গা

কথাগুলি কুরে কুরে খাচ্ছে অশোক পারমার আর কুতুবউদ্দিন আনসারিকে। প্রথম জন ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার মারমুখী যুবক, দ্বিতীয়জন হাতজোড় করে প্রাণভিক্ষার কাতর আবেদন জানাচ্ছেন তার সামনে। বীভৎস সে দৃশ্য সংবাদমাধ্যমের দৌলতে যারা দেখেছেন, শিউরে উঠেছেন। এবারের দিল্লি দাঙ্গা নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতেই কুতুব বলেন, 'দাঙ্গা কী দেয়? পারস্পরিক অবিশ্বাস! দিল্লিতে দেখছেন না? সব কিছু ভেঙে, পুড়িয়ে ভাল থাকা যায়? মানুষ যদি মানুষকে বিশ্বাস না করে, কে করবে?' আর অশোকের প্রতিক্রিয়া, ' সকলের কাছে আবেদন, বিদ্বেষ আর ঘৃণার রাজনীতির ফাঁদে পা দেবেন না। দাঙ্গার মতো ভয়ানক আর কিছু হয় না।' কুতুব সেলাইয়ের কাজ করেন, অশোকের জুতোর দোকান। নাম 'একতা চপ্পল হাউস'। অশোকের কথা, 'ভুল রাজনীতির শিকার হয়েছিলাম। সারা জীবন আফশোস করতে হবে। শান্তি রাখুন। শান্তিতে থাকুন।' আর কুতুবের কথা— ' কেউ যেন আর ভুল রাজনীতির শিকার না-হন।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯ ফেব্রুয়ারি)

শিবদাস ঘোষ মেমোরিয়াল ভবন ও এমএসসি-র উদ্যোগে ২৩ ফেব্রুয়ারি ঘাটশিলার পঞ্চ পাণ্ডবে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

জেলায় জেলায় এনপিআর-সিএএ-এনআরসি বিরোধী নাগরিক কনভেনশন

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ ২২ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনার মছলন্দপুরে সিএএ, এনপিআর এবং এনআরসি প্রতিরোধে নাগরিক কনভেনশন হয়। এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচকরা

বলেন, দেশের অর্থনীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের গভীর সংকটকে আড়াল করবার জন্য মোদি সরকার এই ভয়াবহ পদক্ষেপ নিচ্ছে। একে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরাস্ত করতে হবে। উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস। নিমাই মজুমদার কে সভপতি এবং অধ্যাপক অভিজিৎ ব্যানার্জীকে সম্পাদক করে ২০ জনের কমিটি গঠন করা হয়।

কলকাতা ঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বেলেঘাটায় সুইটি ড্রিম হলে সিএএ, এনপিআর, এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির বেলেঘাটা শাখা গঠিত হয়। এলাকার বিশিষ্ট শিল্পী, লেখক, ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'হিন্দুদের নাগরিকত্ব পেতে কোনও সমস্যা হবে না' বলে বিজেপি নেতারা যে মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছেন তার অসারতা আসামের বাস্তব সত্য থেকেই প্রমাণিত। আগামী ১ এপ্রিল থেকে এনআরসি-র প্রথম ধাপ এনপিআর বয়কট আন্দোলন নিচু থেকে গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান। অতিথি বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সম্পাদক সৌমেন দাস। কনভেনশন

থেকে স্থানীয় বিশিষ্টজনদের উপদেষ্টা করে প্রবীণ শিল্পী বিষ্ণু দাস কে সভাপতি এবং মাস মুখোপাধ্যায় ও সীমা সরকারকে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করে ৩৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

হাওড়া ঃ ২২ ফেব্রুয়ারি বাগনানে এনআরসি, এনপিআর, সিএএ বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য আলোচক ছিলেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সহ সভাপতি জীবন দাস। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার নাগরিকত্ব হরণকারী ও ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টিকারী এই কালাকানুন প্রত্যাহার না করলে মানুষ জীবন দিয়ে তা রুখবে। শিক্ষক হাফিজুর রহমান খানকে সভাপতি, শ্রীমন্ত ধাড়া ও সেখ

আজাহার উদ্দিনকে যুগ্ম সম্পাদক করে কমিটি গঠিত হয়। এনআরসি বিরোধী গান ও স্বরচিত কবিতা পাঠ কনভেনশনকে প্রাণবন্ত করে।

দার্জিলিং ঃ ২৩ ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং শহরে সিএএ, এনপিআর, এনআরসি বিরোধী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী শঙ্কর হাঙ্ক সুব্বা, শিক্ষক প্রভাকর ময়লানী, শিক্ষক ভুবন ছেত্রী, সমাজকর্মী প্রবীণ গুরুং এবং আনজুমান সংস্থার অন্যতম কর্ণধার আলাউদ্দিন শেখ ও শেরপা বোর্ড-এর সভাপতি ফুরবা শেরপা।

কনভেনশন পরিচালনা করেন লিজা হিল স্কুলের শিক্ষক ভুবন

ছেত্রী। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন অন্যতম আহ্বায়ক জয় লোধ। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন প্রভাকর ময়লানী, প্রবীণ গুরুং, শঙ্কর হাঙ্ক সুব্বা। অন্যতম বক্তা ছিলেন ঝড় পত্রিকার সম্পাদক অচিন্ত্য সিংহ। শঙ্কর হাঙ্ক সুব্বাকে সভাপতি এবং নিমা জ্ঞানচন শেরপা ও জয় লোধকে যুগ্ম সম্পাদক করে ১২ জনের দার্জিলিং হিল (টাউন) কমিটি গঠিত হয়।

কালা আইন এনআরসি, সিএএ, এনপিআর বিরোধী বিক্ষোভ, গোয়ালপোখর, উত্তর দিনাজপুর

দিল্লি গণহত্যার প্রতিবাদে কলকতার চাঁদনি চকে মানব বন্ধন। ২৯ ফেব্রুয়ারি

জনস্বার্থবিরোধী এনআরসি, সিএএ, এনপিআর বিরোধী কনভেনশন। জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ

धर्मীয় বিভাজনসৃষ্টিকারী এনআরসি, সিএএ, এনপিআর বিরোধী বিক্ষোভ। গুনা, মধ্যপ্রদেশ

রূপোলি রেখা

● ছ'জনকে বাঁচিয়ে অগ্নিদগ্ধ প্রেম। প্রেমকান্ত বাঘেল। উত্তর-পূর্ব দিল্লির শিববিহার এলাকায় দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বেশ কিছু মুসলিম বাড়িতে। আগুনের ব্যূহে আটকে পড়ে তাঁর প্রতিবেশী একটি পরিবার। প্রেমকান্ত আগুনের ভিতর থেকে একের পর এক সদস্যকে বার করে আনতে গিয়ে নিজে অগ্নিদগ্ধ হন। তবুও আটকে ছিলেন এক বৃদ্ধা। তাঁকে বাইরে নিয়ে আসতে গিয়ে তাঁর শরীরের ৭০ শতাংশই পুড়ে যায়। হাসপাতালে তিনি এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। শরীরে তাঁর তীব্র দহন জ্বালা। কিন্তু মনে প্রতিবেশীকে বাঁচানোর পরম তৃপ্তি।

● মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল মুস্তাফাবাদ। সেখানে একটি মসজিদে আগুন লাগিয়েছে দুষ্কৃতীরা। কিন্তু মসজিদ জ্বলতে দেখেও কোনও প্রতিক্রিয়ার শিকার হননি মুসলিম ধর্মাবলম্বী নাগরিকরা। এই এলাকায় রয়েছে একটি শিবমন্দির। মন্দির থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে থাকেন কামরুদ্দিন। স্থানীয় চায়ের দোকানে খাবার সরবরাহ করে সংসার চালান তিনি। কামরুদ্দিন বললেন, "দীর্ঘদিন ধরে আমরা একসঙ্গে রয়েছি। কখনও সংঘর্ষের কথা ভাবতেই পারিনি। এই কঠিন সময়ে মানবতা রক্ষা করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদ জ্বলে গিয়েছে জানি, কিন্তু মন্দিরে কোনও আঁচ লাগতে দেব না"।

● শিববিহার এলাকায় প্রায় পাঁচশো জনের একটি হিংস্র দল ঢুকে আগুন লাগায়। সালিম কাসারের মাথায় বজ্রাঘাত। চোখের সামনে দেখলেন তাঁর দাদাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল দুষ্কৃতীরা। প্রাণ বাঁচাতে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন পড়শি এক হিন্দুর বাড়িতে। উন্মত্ত জনতার হাত থেকে তাঁদের বাঁচাতে হিন্দু দম্পতি সালিমের মাথায় কেটে দেন তিলক, আর স্ত্রীর সিঁথিতে দিয়ে দেন সিঁদুর। এভাবেই পরিবারটিকে বাঁচান তাঁরা।

সম্প্রীতির এমন দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে একতরফা গণহত্যায় বিধ্বস্ত রাজধানীর অলিতে গলিতে। ভস্মের মাঝে যেন মুক্তো! সভ্যতার সঙ্কট দেখে রবীন্দ্রনাথ গভীর ব্যথায় লিখেছিলেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। গণহত্যাকারীরা মানুষে মানুষে বিশ্বাসের ভিতে অনেকখানি ফাটল ধরালেও ঐক্যের রূপোলি রেখাও আছে।

লক্ষ লক্ষ আদিবাসী ও বনবাসী মানুষের উচ্ছেদের সরকারি অপচেষ্টা প্রতিরোধ করুন

- আদিবাসি ও চিরাচরিত বনবাসীদের উচ্ছেদ বন্ধ
- আদিবাসী সহ সকল বনবাসী ও ভূমিহীনদের পাট্টা প্রদান
- সি এন টি অ্যাক্ট, এস পি টি অ্যাক্ট ও পেশা কানুন সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা
- ফরেস্ট অ্যাক্ট সংশোধনী বিল ২০১৯ প্রত্যাহার করে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট-২০০৬ চালু
- এন আর সি, সি এ এ, এন পি আর বাতিলের দাবিতে

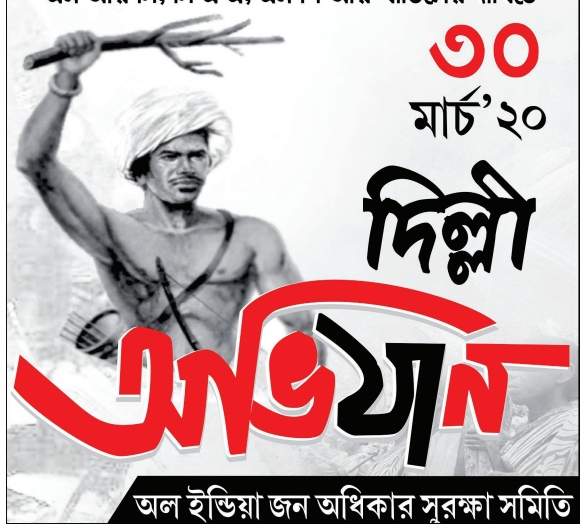

বিচারপতি মুরলিধরের আকস্মিক বদলি

সংসদীয় গণতন্ত্র একটি ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে

বিচারপতি এস মুরলিধর-এর বদলি প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ আজ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি এস মুরলিধরকে একটি রায় দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেভাবে চটজলদি বদলি-নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিজেপি শাসনে তা মোটেই আশ্চর্যের নয়। দিল্লি দাঙ্গায় যখন নিরীহ মানুষ মরছে, ঘরবাড়ি-দোকানপাট জ্বলছে তখন পুলিশের ইচ্ছাকৃত চরম নিষ্ক্রিয় ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করার সাহস দেখান বিচারপতি মুরলিধর এবং এত মৃত্যু, অগ্নিসংযোগ, লুঠপাটের জন্য পুলিশকেই দায়ী করেন। যেসব বিজেপি নেতা প্রকাশ্যে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে পুলিশকে নির্দেশ দেন। বিচারপতি মুরলিধরের এই সাহসী ভূমিকার 'পুরস্কার' হিসাবেই তাকে রাতারাতি বদলি করা হয়েছে। একজন বিচারকের এ হেন 'স্পর্ধা' কীভাবে সহ্য করবে বিজেপি সরকার?

দাবি করা হয় যে, বিচার ব্যবস্থা হচ্ছে স্বাধীন এবং তার কাজে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় দীর্ঘ কাল থেকে একথা শুধু কাগজেই লেখা রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে এটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সংসদীয় গণতন্ত্র এখন একটি ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে।

বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার ছিটেফোঁটা যতটুকু আমাদের দেশে ছিল, ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকে তা লোপ পেতে শুরু করে। এখন কফিনে শেষ পেরেকটি মারছে বিজেপি। যারা বিজেপি সরকারের লেজুড়বৃত্তি করছেন অন্যায়ভাবে তাদের পদোন্নতি ঘটানো হচ্ছে এবং যারা সরকারের মর্জিমতো রায় দিচ্ছেন না এমন বিচারকদের বদলি করে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি বিচারপতি লোয়াকে রহস্যজনক মৃত্যুর শিকার হতে হয়েছে। তাঁর পরিবার দাবি করেছে, বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগের মামলায় টাকার বিনিময়ে বিচার বদলে দিতে রাজি না হওয়ার জন্যই তাঁকে খুন করা হয়। তাঁরা এই রহস্যমৃত্যুর তদন্ত দাবি করেন, কিন্তু সে ব্যাপারে কর্ণপাত করা হয়নি।

এইভাবে বিচারব্যবস্থা শাসক দল ও শাসক শ্রেণি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের সেবাদাসে পর্যবসিত হয়েছে। বিচার ব্যবস্থার আপাত নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়েছে যা কেবল অবিচারই করে চলেছে। দেশের পক্ষে এ এক সমূহ বিপদ।

এটিএম কর্মীদের আন্দোলনে জয়

লাগাতার আন্দোলনের ফলে এটিএম কর্মীদের দাবি মানতে বাধ্য হল স্টেট ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট। ডিসেম্বর '১৯ থেকে এসবিআই-এর এটিএম-এ কর্মরত কন্ট্রাকচুয়াল কর্মীরা বেতন পাচ্ছিলেন না। অবিলম্বে বকেয়া বেতন দেওয়ার দাবিতে ২৪ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পক্ষ থেকে এসবিআই লোকাল হেড অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২ মার্চ সেখানে কর্মীরা বিক্ষোভ সভা করেন। এদিন ফোরামের সভাপতি জে রায় মণ্ডল এবং সাধারণ সম্পাদক এন সি পোদ্দারের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, ব্যাঙ্ক সরাসরি পেমেন্ট করবে অথবা অন্য কোনও (ওরিয়ন ছাড়া) ভেন্ডরের মাধ্যমে পেমেন্ট করবে। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই জয়ের জন্য এটিএম কর্মীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হয়।

দিল্লি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ কলকাতা হাইকোর্টে

২ মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের মূল গেটের সামনে জমায়েত করে দিল্লি হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন আইনজীবীরা। লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে এদিনের প্রতিবাদ সভা থেকে বিচারপতি এস মুরলিধরের অন্যায্য বদলির নিন্দা করা সহ বিজেপি সরকারের সাম্প্রদায়িক ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপকে ধিক্কার জানানো হয়।

দিল্লি গণহত্যা প্রসঙ্গে

২৭ ফেব্রুয়ারি নিউ দিল্লির জিটিবি হাসপাতালে আহতদের সাথে দেখা করে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রতাপ সামল, দিল্লি রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড হরিশ ত্যাগী এবং এআইডিএসও-র সর্বভারতীয় কমিটির কমরেড দীনেশ মহন্ত।

একের পাতার পর

অসুবিধাই হয় না। বিজেপি সরকার নতুন করে দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের হীন মতলবে এনআরসি-সিএএ-এনপিআর আনার পরিকল্পনা করেছে। কিন্তু ভাষা-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এই জনবিরোধী পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নানা জায়গায় ফেটে পড়েছে। আন্দোলনের উপর পুলিশ এবং বিজেপি-আরএসএসের হামলায় বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, অনেকেই আহত। প্রধানমন্ত্রী নিজে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার মতলবে 'বিক্ষোভকারীদের পোশাক দেখেই চেনা যায়' বলে ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু এই অপচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল বা নামকরা নেতার ডাক ছাড়াই শাহীন বাগে মূলত মহিলাদের উদ্যোগে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তা অভূতপূর্ব এবং ঐতিহাসিক। নানা হুমকি উস্কানি সত্ত্বেও মানুষের সমর্থনে এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ এবং নির্ভীকভাবে এগিয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে সারা দেশের নানা প্রান্তে শাহীন বাগের আদলে অসংখ্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের জোয়ার দেখে আতঙ্কিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লি নির্বাচনী জনসভার ভাষণে বলেছিলেন, বিজেপিকে ভোট দিয়ে শাহীন বাগে বৈদ্যুতিক শক লাগান। আর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও একধাপ এগিয়ে বলছেন, 'গোলি মারো শালোঁ কো'। দিল্লির মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে এর উত্তর দিয়েছেন। তারপর দিল্লির বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র কিছু এলাকায় ধরনা তুলে দিতে তিন দিনের চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। প্রতিবাদী মানুষ এই হুমকি উপেক্ষা করায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীনস্থ দিল্লি পুলিশের মদতে 'জয় শ্রীরাম', 'হিন্দুস্তান হিন্দুয়োঁ কো' ইত্যাদি ধ্বনি তুলে এই অবস্থানের উপর আক্রমণ চলে। কপিল মিশ্র বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেছেন, প্রতিবাদীদের হঠাতে তাঁর কর্মসূচি সফল। এ কথা জলের মতো পরিষ্কার, যে বর্বরতা চলছে, তার জন্য বিজেপি-আরএসএস এবং তাদের পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারই একশো শতাংশ দায়ী। উল্লেখ্য যে, জামিয়া মিলিয়া, জেএনইউ-তে যারা আক্রমণ করেছিল, উত্তরপ্রদেশের নানা এলাকায় যারা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তাদের শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, গ্রেপ্তারের চেষ্টাই করা হয়নি।

আজ এই প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক যে, পাকিস্তানের মতো একটি দেশ যা ইসলামী মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্য বলে পরিচিত এবং বাংলাদেশ, যেখানে সংখ্যাগুরু মানুষ মুসলমান সেই দেশগুলিতে বিগত ২০ বছরে ক'টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সংখ্যালঘু নিধনের ঘটনা ঘটেছে? কিছু ক্ষেত্রে জোর করে বা স্বেচ্ছায় ভিন্নধর্মে বিয়ে নিয়ে কিছু ঘটনা ঘটেছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ', 'গণতান্ত্রিক' ভারতকে এই দেশগুলির পাশে রাখলে দেখা যাবে পিটিয়ে হত্যা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের হত্যায় ভারতই এগিয়ে। দেশের পক্ষে এই চরম লজ্জার দায় শাসকদের। শাসকরা দেশটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা ভেবে দেখার জন্য দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আমরা আবেদন করছি।"

দিল্লিতে বিজেপি সরকারের মদতে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড

প্রতিবাদে দিকে দিকে ধিক্কার

পাটনা, বিহার

কোচবিহার, উত্তরবঙ্গ

পশ্চিম মেদিনীপুর

পাঠকের মতামত

‘শো ইয়োর ক্রেডেনশিয়ালস্’

সারাজীবন গীর্জার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন যে মানুষ, তাঁর মৃত্যুশয্যায় হঠাৎ এক পাদ্রী এসে উপস্থিত। মৃত্যুর সময় যদি তিনি তাঁর পাপের স্বীকারোক্তি করে না যান তাহলে তো নরকেও তাঁর ঠাঁই হবে না। সুতরাং তাঁর শুভচিন্তায় পাদ্রীর আগমন। একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল— হঠাৎ দেখলেন এক পাদ্রী এসে ঢুকছেন তাঁর ঘরে। ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সেই শয্যাশায়ী— ‘আপনি কোত্থেকে আসছেন মাননীয়?’ পাদ্রী উত্তর দিলেন ‘.... স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে’। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন সেই ব্যক্তি— ‘ইয়োর ক্রেডেনশিয়ালস, আপনার ঈশ্বরের পরিচয়পত্রটি দেখান।’ (সূত্রঃ স্টোরি অফ ফিলজফি: উইল ডুরান্ট)

উপরোক্ত ঐ ব্যক্তি আর কেউ নন, ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার। প্রায় ২৫০-৩০০ বছর আগে ইউরোপে নবজাগরণের অন্যতম বলিষ্ঠ চিন্তানায়ক ও পুরোধা, যার চিন্তায় ভর করেই যুক্তিবাদী দর্শন ও চিন্তার বিকাশ হয়েছিল বিশ্বে।

আজকের বিজেপি-আরএসএস শাসিত ভারতবর্ষে, নাগরিকত্বের প্রমাণ চাইতে আগামী ১ এপ্রিল থেকে সরকারি লোকজন আপনার বাড়িতে আসবেন। তখন ‘ভলতেয়ার’ হওয়ার সুযোগ রয়েছে আপনার। যদি আপনিও বলতে পারেন —‘মাননীয়, দয়া করে আপনার নাগরিকত্বের প্রমাণটি যদি দেখান’।

শর্বরী বসু, শিয়ালদা

জেলায় জেলায় চিটফান্ড প্রতারিতদের বিক্ষোভ

মালদা ঃ অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী আন্দোলন চলছে। চলমান আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অ্যাসোসিয়েশনের মালদা জেলা কমিটির উদ্যোগে ৩০ জানুয়ারি এনআরসি-সিএএ বাতিল, আমানতকারীদের টাকা ফেরত এবং এজেন্টদের সুরক্ষা সহ ৬ দফা দাবিতে দুই শতাধিক প্রতারিত এজেন্ট ও আমানতকারী মিছিল করে কোর্ট চত্বরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী। জেলা সম্পাদক জিয়াউল রহমানের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল এসপি-কে স্মারকলিপি দেয়।

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ উপরোক্ত দাবিতে অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ১ ফেব্রুয়ারি দুই শতাধিক প্রতারিত মানুষের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী, জেলা নেতা তফিরুদ্দিন মণ্ডল, দেবব্রত দে সহ অন্যান্যরা।

মুর্শিদাবাদ ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে ৭ ফেব্রুয়ারি তিন শতাধিক মানুষ জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে মিছিল করে বিক্ষোভে সামিল হন।

মুর্শিদাবাদ

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য

ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। *প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

২। *প্রকাশের কাল ঃ সাপ্তাহিক*

৩। *মুদ্রকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

৪। *প্রকাশকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

৫। *সম্পাদকের নাম ঃ মানিক মুখার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

৬। *স্বত্বাধিকারী ঃ সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

আমি, মানিক মুখার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।

মানিক মুখার্জী

১.৩.২০২০ *প্রকাশকের স্বাক্ষর*

খরচ হল দেড়শো কোটি টাকা জনগণ কী পেল?

ট্রাম্পের ভারত সফর

মহা আড়ম্বরে হয়ে গেল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারত সফর। শুধু তাঁর আপ্যায়নে ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি— এই দু'দিনের মোট ৩৫ ঘন্টায় খরচ হয়ে গেল দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের ঘাম-রক্ত মাখা দেড়শো কোটিরও বেশি টাকা। এর আগেও মার্কিন প্রেসিডেন্টদের ভারত সফর দেখেছে মানুষ। কিন্তু দক্ষিণপন্থী এক মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি নিজের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদী কার্যকলাপ, বর্ণবিদ্বেষ, ঘরহারা অভিবাসীদের প্রতি নির্মমতা ও বেশ কয়েকটি যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনায় পূর্ববর্তীদের ছাপিয়ে গেছেন, তাঁকে ভারতে স্বাগত জানাতে যে এলাহি বন্দোবস্তের আয়োজন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং যেভাবে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রদর্শনী করলেন, তা আগে কখনও দেখা যায়নি।

এ ঘনিষ্ঠতা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। মতাদর্শগত ভাবে চরম হিন্দুত্ববাদী, সাম্প্রদায়িক বিজেপির বড়কর্তা নরেন্দ্র মোদি ও চরম দক্ষিণপন্থী, বর্ণবিদ্বেষী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক নৌকারই সহযাত্রী। তবে এটুকুই সব নয়। এই সফর করা ও করানোর মধ্য দিয়ে দুই রাষ্ট্রনেতাই নিজের নিজের দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির ঝুলি ভরে দেওয়ার পাশাপাশি নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা চালিয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিরক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে ডুবতে থাকা মার্কিন কোম্পানিগুলি ও সেখানকার অর্থনীতিকে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করা। পাশাপাশি চীনের সাথে বাণিজ্যের টক্করে জিততে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভারতকেও সহযোগী হিসাবে পাওয়া। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদিও চেয়েছিলেন আমেরিকার সাথে বাণিজ্য চুক্তির পাশাপাশি চীনের দখলে থাকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে ভারতীয় পুঁজিপতিদের কিছুটা অন্তত জায়গা করে দেওয়ার জন্য দুর্বল দেশগুলিকে সামরিক নখ-দাঁত দেখানো। তাই মোদির চাই ট্রাম্পের সাহায্য।

এসব অর্থনৈতিক ও কৌশলগত উদ্দেশ্য ছাড়াও ট্রাম্প ও মোদি— দু'জনেরই নিজস্ব রাজনীতিগত কিছু স্বার্থসিদ্ধির বিষয় ছিল। সফরের সময়টা লক্ষ করার মতো। আমেরিকায় এ বছরেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ফলে প্রার্থী হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায় রয়েছে ভারতের মতো বিরাট মাপের বাজারওয়ালা একটি দেশের সঙ্গে শত শত কোটি ডলারের অস্ত্রচুক্তি এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে ভারতের শক্তিকে যথাসম্ভব ব্যবহার করে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতি, বহুজাতিক সংস্থার মালিকদের মুনাফা লুঠের বন্দোবস্ত করে দেওয়া। এর মাধ্যমে তাদের কাছে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করা। এতে আসন্ন নির্বাচনে আবার ক্ষমতায় আসার পথ সুগম হবে। অন্যদিকে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির পাশাপাশি মার্কিন সহযোগিতা পেয়ে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বাড়িয়ে দেশীয় পুঁজিপতিদের আস্থা ধরে রাখার সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। বিজেপির কাশ্মীর নীতির ব্যর্থতা প্রকট। এনআরসি, সিএএ চালু করা সহ বহু নগ্ন সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপে শাসক দল বিজেপির নেতা হিসাবে মোদি ও অমিত শাহের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশ্বের দরবারে মাথা হেঁট হয়েছে। মোদি চেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে দেশে নিয়ে এসে, বিপুল অঙ্কের যুদ্ধাস্ত্র কেনা সহ নানা সুবিধা দিয়ে তাঁর সঙ্গে ব্যাপক ঘনিষ্ঠতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার বড়দাদা আমেরিকার সমর্থন আদায় করতে। এর দ্বারা একদিকে দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণির আস্থা অর্জন, অন্য দিকে দেশের অগণিত মানুষের সামনে নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন— এই ছিল নরেন্দ্র মোদির প্রধান উদ্দেশ্য।

ফলে বিশ্বের মানুষ সাক্ষী থাকল পারস্পরিক পিঠ চাপড়ানির এক অভিনব প্রদর্শনীর। ২০১৯-এ আমেরিকার হাউস্টনে ‘হাউডি মোদি’ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ট্রাম্প ৫০ হাজার অভিবাসী ভারতীয়ের সামনে মোদিকে ‘হিরো’ হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। এবার ‘নমস্তে ট্রাম্প’-এর মধ্য দিয়ে মোদিজি ট্রাম্পসাহেবকে তার কৃতজ্ঞ প্রতিদান দিলেন। আমেরিকার নাগরিকত্ব নেওয়া ভারতীয়দের ২৫ শতাংশই গুজরাটি হওয়ায় ‘নমস্তে ট্রাম্প’-এর সূচনা করা হয়েছিল গুজরাটে। সেখানে মোতেরা স্টেডিয়ামে এবং আমেদাবাদ থেকে সবরমতী আশ্রমে যাওয়ার ২২ কিমি রাস্তায় বহু মানুষকে জড়ো করে, তাদের দিয়ে মিনিটে মিনিটে ট্রাম্পের জয়ধ্বনি তুলিয়ে আসন্ন নির্বাচনে মার্কিনী-ভারতীয়দের ভোট তাঁর দিকে টানার ব্যবস্থা করে দিলেন মোদি। বিনিময়ে ট্রাম্প সিএএ, এনআরসি, কাশ্মীরের মানুষের উপর নির্মম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, এমনকি সফর চলাকালেই রাজধানী দিল্লিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীদের পরিকল্পিত ভয়ঙ্কর হামলা নিয়ে শুধু মুখ বন্ধ রেখেছেন তাই নয়, মোদিকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সার্টিফিকেট পর্যন্ত দিয়ে গেছেন।

পরদিন দিল্লিতে ট্রাম্প সাহেবের সঙ্গে মোদির কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কেমন সেই চুক্তি? দুই রাষ্ট্রপ্রধান মোট তিনটি চুক্তি করেছেন— প্রতিরক্ষা, প্রাকৃতিক গ্যাস ও স্বাস্থ্য বিষয়ে। কথা হয়েছে ভারত ৩০০ কোটি ডলার, অর্থাৎ প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা খরচ করে বেশ কিছু মার্কিন সমরসম্ভার কিনবে। মার্কিন সংস্থা এক্সন মোবিলের সঙ্গে ইন্ডিয়ান অয়েলের চুক্তি অনুযায়ী ভারত আমেরিকা থেকে আরও বেশি পরিমাণে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস কিনবে। এছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েও দু'দেশের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। তবে ভারতীয় শিল্পপতিদের বহুপ্রতীক্ষিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথা বিশেষ এগোয়নি। এক কথায় জনগণের কষ্টার্জিত দেড়শো কোটি টাকা ব্যয়ে ট্রাম্পের এই মহাসফরের মধ্য দিয়ে দেশের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনে সামান্য সুফল আনার ব্যবস্থা করা দূরের কথা, এমনকি শিল্পপতিদের জন্যও বিশেষ সুবিধা জোগাড় করতে পারলেন না মোদি।

আরেকটি বিষয় লক্ষ করার মতো। দুই রাষ্ট্রপ্রধান এবার ঘোষণা করেছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করবেন তাঁরা। অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদির সহযোগিতায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চলেছেন ট্রাম্প— যিনি দুনিয়া জুড়ে দুর্বল দেশগুলিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আগ্রাসন লাগাতার চালিয়ে যাচ্ছেন! এই চুক্তির অন্যদিকে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদি যিনি নগ্ন সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বেলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এ দেশের সাধারণ মানুষের ঐক্য ভেঙে দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন— যা তাঁর রাজনীতির তুরুপের তাস। আর এঁরাই নাকি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একযোগে কাজ করবেন! এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে!

ট্রাম্পের এই সফর প্রমাণ করল ‘রতনে রতন চেনে’। ঘৃণার কারবারি দুই রাষ্ট্রপ্রধান মিলিত হয়ে একে অপরের পিঠ চাপড়ে নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা চালিয়ে গেলেন, যার সঙ্গে দুই দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের কোনও যোগ নেই। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবাদ উঠেছে। দেশ জুড়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ নানা সংগঠনের নেতৃত্বে আওয়াজ তুলেছেন ‘ট্রাম্প ফিরে যাও’। পোড়ানো হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন প্রেসিডেন্টের কুশপুতুল। বিক্ষোভ হয়েছে মার্কিন দূতাবাসের সামনেও।

বাসদ (মার্কসবাদী) থেকে কিছু নেতা-কর্মীর বহিষ্কার প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার আবদুস সালাম মিলনায়তন, জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাসদ (মার্কসবাদী)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তৃত বক্তব্য রাখেন। এ দেশেও অনেকেই ঘটনার সত্যাসত্য জানতে চাইছেন। তাই আমরা এটি প্রকাশ করছি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-র অভ্যন্তরীণ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বিষয় আপনাদের মাধ্যমে বাম মহল সহ দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে আজকের এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের আহ্বানে এখানে উপস্থিত হবার জন্য প্রথমেই আমি দলের পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনারা নিশ্চয় ইতিমধ্যে নানা সূত্রে অবহিত হয়েছেন যে, দলের মূলনীতিবিরোধী অবস্থান ও ধারাবাহিকভাবে সাংগঠনিক নিয়ম-শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী ও কেন্দ্রীয় নির্ধারিত ফোরামের ১৬ জন সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দল থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হওয়ার দুঃখজনক ঘটনা প্রসঙ্গে দলের বক্তব্য আমি এখানে তুলে ধরব।

আমাদের দল বাসদ (মার্কসবাদী), প্রতিষ্ঠার পর থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে একটি সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রাম করছে, যা আগামী দিনে এ দেশের শোষণমূলক পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র কায়েমের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। বর্তমানে আমরা বাম গণতান্ত্রিক জোটের শরিক হিসেবে আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ও সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যা-সংকট নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। দেশে এখন যে ধরনের ফ্যাসিবাদী স্বৈরশাসন চলছে, তার বিরুদ্ধে লড়াইটা একটা সহজ কাজ নয়। আমাদের কর্মীরা দৃঢ় মনোবল ও সাহস রেখে বিভিন্ন এলাকায় এই কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা এখনও শক্তিতে ছোট, কিন্তু আমাদের এ বিশ্বাস আছে যে, সঠিক পথে আমরা যদি চলতে পারি, তাহলে গণআন্দোলনের পথে জনতার রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে আমরা ভূমিকা রাখতে পারব।

সম্প্রতি দলের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী সহ কিছু নেতা-কর্মীর ব্যাপারে আমাদের সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। দলের কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির ১৬ ফেব্রুয়ারির সভায় দলের নির্ধারিত ফোরামের ১৬ জন সদস্যকে বহিষ্কার করা হয় এবং কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তীকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়। তিনি এ নোটিসের কোনও জবাব দেননি। এরই মধ্যে তিনি, ১৬ জন বহিষ্কৃত নেতা-কর্মী ও তাদের সহযোগীরা মিলে বিভিন্ন জায়গায় বাসদ (মার্কসবাদী) নামে পৃথক কর্মকাণ্ড করছেন, মিডিয়াতে বক্তব্য দিচ্ছেন। এতে মানুষের মধ্যে কিছু প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে, কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

কেন্দ্রীয় নেতা হয়েও কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সাথে মতপার্থক্যজনিত ক্ষুব্ধতার শিকার হয়ে গত ৩ বছর ধরে পার্টির প্রায় সব সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে দলের প্রতিটি হাউসে ভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন, জেলা পর্যায়ে বা ইনফরমাল আলোচনায়ও বলেছেন। যত্র-তত্র দলের সমালোচনা করা, উর্ধ্বতন পার্টিবডির আলোচনা নিচের স্তরে শেয়ার করা, নতুন কর্মীদেরও ডেকে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বোঝানো, নেতৃত্বকে না জানিয়ে গোপন মিটিং করা— এসব কর্মকাণ্ড তিনি সহ দলের কিছু নেতা-কর্মী গত কয়েক বছর ধরে করে চলেছেন। এসব কর্মকাণ্ড একটি বিপ্লবী দলের শৃঙ্খলা ও আচরণবিধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পার্টি বারবার তাদের বোঝানো ও সংশোধনের চেষ্টা করেছে, গত ৩ বছর ধরে নেতা-কর্মীদের জড়িয়ে আদর্শগত আলোচনার প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ভিন্নমত নিরসনের চেষ্টা করে চলেছে।

কিন্তু, গত কয়েক মাস আগে থেকে হঠাৎ করেই তিনি সহ কিছু নেতা-কর্মী বলতে শুরু করেন, বাসদ (মার্কসবাদী), এর পূর্বে বাসদ-ও, কোনও পার্টি হিসেবেই গড়ে ওঠেনি। বর্তমানে পার্টি নামে থাকা এই ব্যক্তিসমষ্টির শ্রেণিচরিত্র তারা র‍্যাডিক্যাল পেটিবুর্জোয়া মনে করেন, অর্থাৎ বাসদ (মার্কসবাদী) একটি পেটিবুর্জোয়া ফ্র্যাকশন। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা নিয়ে আমাদের আবেগ ছিল বা তা আমরা প্রচার করেছি, কিন্তু এর কোনও চর্চা-প্র্যাকটিস বা জীবনে পালন হয়নি। ১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত আমরা পেটিবুর্জোয়া রাজনীতির চর্চা করে এসেছি, যা গত ৪০ বছর ধরে আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। তাঁরা কেন্দ্রীয়

বক্তব্য রাখছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

কার্যপরিচালনা কমিটি সহ দলের সকল কাঠামো ভেঙে দিয়ে 'নতুন করে শুরু করা'র কথা বলে প্রকারান্তরে দল ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তাদের এইসব বক্তব্য বাস্তবে দলের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছে এবং ২০১৩ সালে বাসদ-এর অভ্যন্তরে মতবাদিক সংগ্রামকে একটা গ্রুপ কন্ট্রাডিকশন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী গত ১ বছরে কখনও বলেছেন দলে 'পেটিবুর্জোয়া কর্মপদ্ধতি' বিদ্যমান, কখনও পেটিবুর্জোয়া প্রবণতা বাড়ছে, কখনও পেটিবুর্জোয়া প্রবণতা প্রাধান্যে আছে, শেষ পর্যন্ত তিনি দলটা আর শ্রমিকশ্রেণির দল নয়, এটি একটি পেটিবুর্জোয়া দল— এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায়, পরিকল্পিতভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য একের পর এক পরিবর্তন করেছেন। এসব কি একটা আদর্শিক সংগ্রাম, নাকি দলবিরোধী ও উপদলীয় কর্মকাণ্ডের অংশ?

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সর্বশেষ বক্তব্য নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির দুটি সভায় তর্ক-বিতর্কে কমিটির বাকি ৬ সদস্য তাঁর বক্তব্যের বিরোধিতা করেন এবং তাঁকে এই চিন্তা পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। এই প্রেক্ষিতে গত ১০-১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ কেন্দ্রীয় নির্ধারিত সদস্য ফোরামের সভার শুরুতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে বলা হয়। তাঁর বক্তব্যের ওপর নির্ধারিত সদস্যদের হাউসে কমরেডরা আলোচনা করেছেন ও মত দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি, বর্ধিত ফোরাম ও নির্ধারিত ফোরামের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা তাঁর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমরা এর মধ্যে দেখলাম যে, কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী দলের বিরুদ্ধে প্রেসের কাছে বক্তব্য রাখলেন, কয়েকটি জেলায় তিনি ও তার সহযোগীরা প্রকাশ্যে পৃথক সভা করলেন। দলবিরোধী অবস্থান ও কর্মকাণ্ডের কারণে দলের কার্যপরিচালনা কমিটি গত ১৬ ফেব্রুয়ারির সভায় ১৬ জনকে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারির সভায় কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছে। আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম, যে দলকে তারা পেটিবুর্জোয়া বললেন, যে দলের সব বডি ভেঙে দিয়ে নতুন করে পার্টি প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বললেন, বহিষ্কার করার পর সেই দলের নাম ও পরিচিতিই তারা ব্যবহার করছেন।

বন্ধুগণ, কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরেই দলের নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে সমালোচনা দলের নিচের স্তরে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভ-বিক্ষোভ মিশে ছিল। কিন্তু আমরা তাঁর আচরণকে বড় করে দেখতে চাইনি, তাঁর বক্তব্যের রাজনৈতিক দিককে বিশ্লেষণ করেই সেটার ভুল-শুদ্ধ বিচার করতে চেয়েছি। আমাদের দলের অনেক ঘাটতি নিয়ে দলের বিভিন্ন ফোরামে আমরা নিজেরাই আলোচনা করেছি। কিন্তু, আমরা লক্ষ্য করেছি, রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি বারবার তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। ২০১৭ সালে গৃহীত দলীয় একটি গাইডলাইনে বলা হয়েছিল 'হায়দার ভাইয়ের পরে নেতা কে' — এভাবে আগে থেকে নির্ধারণ করাটা ভুল। বিশেষ সময়ে পার্টি প্রয়োজন ও তুলনামূলক অগ্রবর্তী অবস্থান বিচার করে যৌথমতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, সবার আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত এই গাইডলাইনটি কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী মেনে নিতে পারেননি। কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সাথে ব্যক্তিগত আলোচনায় এবং বিভিন্ন ফোরামে তিনি তাঁর অসন্তোষ ব্যক্ত করে বলেছেন, পরবর্তী নেতা কে, তা ঠিক করে যাওয়ার নজির বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে আছে। কার্য পরিচালনা কমিটির নেতারা তাঁকে বলেন, এ কথা ভুল এবং এ ধরনের আলোচনা মার্কসবাদবিরোধী। এর পরপরই ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে যৌথজীবনের সংগ্রামের অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় পার্টি সেন্টার বিকেন্দ্রীকরণ করে নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে পার্টিমেস গঠনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তিনি কার্যপরিচালনা কমিটি অকার্যকর এই কথা তোলেন, নতুন কনভেনশনের দাবি করেন এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে তাঁর অনাস্থার কথা সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেন। তাঁর মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতা এভাবে দলের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নিচের স্তরে বিরোধিতা করতে থাকলে দলের পরিচালনা প্রক্রিয়াই হুমকির সম্মুখীন হয়।

এরপর থেকে তিনি ও তাঁর অনুগামী নেতা-কর্মীদের একটি অংশ কার্য পরিচালনা কমিটি ভাঙা দরকার— এটি প্রমাণে উদ্যোগী হয়ে পড়েন। দলের কাজকর্মের যা কিছু সমস্যা, নেতৃত্বের ঘাটতি এসবকে বড় করে দেখিয়ে ক্রমাগত নেতিবাচক প্রচার তাঁরা গত প্রায় ৩ বছর ধরে চালিয়ে এসেছেন। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে এমনকি নানা অপপ্রচার চালিয়ে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা, সন্দেহ, অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে দলের কিছু নেতা-কর্মীর তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি, যারা মনে করছেন গত ৩২ বছর ও পরবর্তী ৬ বছর ধরে আমরা পেটিবুর্জোয়া দল করেছি। কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী আগে কখনও পেটিবুর্জোয়া পার্টিসংক্রান্ত কোনও কথা বলেননি। তিনি ও তাঁর অনুসারী অংশটি দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারণার অংশ হিসেবে ওই বক্তব্যটি গ্রহণ করে 'বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষা ও পেটিবুর্জোয়া কর্মপদ্ধতি', 'পেটিবুর্জোয়া প্রবণতা বা উপাদান' এসব আলোচনা ইনফরমালি অনেকদিন ধরে করেছেন। তাঁর এসব কথার সূত্র ধরে কেন্দ্রীয় নির্ধারিত সদস্যদের ফোরামে প্রশ্ন উঠলে মার্চ ২০১৯-এ তিনি পার্টিতে 'পেটিবুর্জোয়া প্রবণতা বাড়ছে বা প্রাধান্যে আসছে, কিন্তু পার্টি পেটিবুর্জোয়া নয়', এমন আলোচনা করেন। এরপর হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটিতে আলোচনা না করে নিচের স্তরে গত কয়েকমাস আগে বলা শুরু করেছেন— 'বাসদ (মার্কসবাদী) একটা র‍্যাডিক্যাল পেটিবুর্জোয়া ফ্র্যাকশন।'

এই ঘটনাক্রম খেয়াল করলে বোঝা যাবে— তাঁর পূর্বের বক্তব্য ও সাম্প্রতিক বক্তব্যে পার্থক্য ও ধারাবাহিকতার ঘাটতি কেন। তিনি যেহেতু ব্যক্তিগত অবস্থান প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষুব্ধ মন নিয়ে চলেছেন এবং সেটাকেই একটা রাজনৈতিক ভাষা দিচ্ছেন, ফলে তাঁর বক্তব্য বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য যত রাজনৈতিক মোড়ক দিয়েই উপস্থাপন করা হোক না কেন, এর উদ্দেশ্য বুঝতে কষ্ট হয় না। উদ্দেশ্য ছিল, কার্যপরিচালনা কমিটির ক্ষমতা খর্ব করা, তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, না পারলে দলকে শ্রেণিচ্যুত ঘোষণা দিয়ে, নেতৃত্বকে অকার্যকর বলে পার্টির ঐক্যকে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত করা, অন্যদিকে সাংগঠনিক কাজে বাধা সৃষ্টি করা। তাঁর এই উদ্দেশ্য দলের অনেক কর্মী-সমর্থক ধরতে পারেননি। তারা কেউ বিভ্রান্ত হয়ে, কেউ নিজেদের তত্ত্বগত ভুল অবস্থান থেকে, কেউ দলের ধীর অগ্রগতি ও ঘাটতি দেখে হতাশ হয়ে, কেউ নিজেদের নানা বিক্ষুব্ধতা থেকে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছেন। এভাবে, তিনি ও তাঁর সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে দলে একটা কোটারি গড়ে তুলেছেন এবং দলের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও কর্মসূচি প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করেছেন। এসবের পরিণতিতে দলকে রক্ষা করার লক্ষ্যে তাদের বহিষ্কার করা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় ছিল না।

আটের পাতায় দেখুন

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় 'নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর' প্রকাশ করা গেল না

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

রাজ্যের কৃষকরাও রাস্তায়

একের পাতার পর

এনপিআর-সিএএ-র মতো নতুন আক্রমণ। দরিদ্র সাধারণ কৃষকের জীবনে এক গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো। চাষ করবে, না কাগজের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরবে? এই ভাবনাতেই তাঁরা কূল পাচ্ছেন না। এদিকে ধান-পাট-আলু-সবজির ন্যায্য দাম চাষি পেল কি না তা নিয়ে রাজ্যের তৃণমূল সরকারেরও কোনও মাথাব্যথা নেই। নেই সস্তায় চাষিকে বিদ্যুৎ, সার, কীটনাশক, বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা।

জয়নগর থেকে শুরু হওয়া কৃষক মার্চ উদ্বোধন করছেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

রামলীলা ময়দানের সমাবেশে মুখে মুখে তাই একই কথা— দাবি আদায়ে লড়তে আমরা প্রস্তুত।

১ মার্চ শুরু হয়েছিল এই 'কিষাণ মার্চ'। তাঁদের দাবি, 'ধান-পাট-আলু-সব্জি-পানের লাভজনক দাম চাই', 'সার-বীজ-তেলের দাম কমাতে হবে', 'মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষকদের ঋণ মকুব করতে হবে', খেতমজুরের সারা বছরের কাজ ও বাঁচার মতো মজুরি চাই', 'খরা-বন্যার হাত থেকে মুক্তি চাই', 'রাজ্য সরকারকে জুট কর্পোরেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল গঠন করে কৃষকের কাছ থেকে ৮০০০ টাকা কুইন্টাল দরে পাট কিনতে হবে', 'এনআরসি-সিএএ-এনপিআর করা চলবে না'।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে কর্মসূচি শুরু হয় ২৯ ফেব্রুয়ারি। উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (সি) পলিটবুরো সদস্য প্রখ্যাত জননেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। কৃষক প্রতিনিধিদের হাতে লাল পতাকা তুলে দিয়ে তিনি মার্চের সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ও এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহর, জলপাইগুড়ি শহর থেকে কিষাণ মার্চ এগোতে শুরু করে। যাত্রাপথে সর্বত্রই জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁরা মার্চে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এলাকায় এলাকায় বহু মানুষ এগিয়ে এসেছেন খাবার, পানীয় জল নিয়ে। দিয়েছেন রাত্রের আশ্রয়। পথের দুধারে কিষাণ মার্চ রেখে গেছে এক প্রত্যয় ভরা প্রতিশ্রুতি। যা মানুষকে অধিকারের দাবিতে লড়তে প্রেরণা দেয়। আবার দুহাত ভরে সাধারণ মানুষ যখন আন্তরিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের সব ক্লান্তি মুছে গিয়ে সঞ্চারিত হয়েছে নতুন শক্তি।

মার্চের প্রস্তুতি চলেছে দেড়মাস ধরে। এর প্রস্তুতিতে অসংখ্য গ্রুপ বৈঠক, পথসভা, হাট মিটিং হয়েছে, স্থানীয় স্তরে ছোট ছোট

তমলুক থেকে কলকাতা কৃষক মার্চ

মার্চ সংগঠিত করা হয়েছে এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজও চলেছে। সর্বত্রই কৃষক-খেতমজুরদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই প্রক্রিয়ায় গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কৃষক-খেতমজুর কমিটি গঠিত হয়েছে— যাঁরা আগামী দিনে রাজ্যের কৃষক আন্দোলনকে আরও সংগঠিত রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

কিষাণ মার্চ শেষে কলকাতার রামলীলা পার্কে কৃষক সমাবেশ হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সেখ খোদাবক্স। প্রধান অতিথি ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর ভাষণে, বর্তমান দিনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি আমদানি করে পুঁজিবাদকে সংহত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি দেখান— কৃষক জীবনের সমস্ত সমস্যার উৎস হল পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ। তাই পুঁজিবাদী এই শোষণের বিরুদ্ধে উন্নত নীতি নৈতিকতার ভিত্তিতে সর্বাত্মক সংগ্রাম গড়ে তুলে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে এদেশের কৃষকের মুক্তি নেই— সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের এটাই শিক্ষা। এই শিক্ষার ভিত্তিতে রাজ্যে আরও শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি

জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি কৃষক মার্চ

হাবড়া থেকে কলকাতা কৃষক মার্চ

আহ্বান জানান। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড পঞ্চানন প্রধান। উপস্থিত ছিলেন ওড়িশার কৃষক নেতা এবং সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য কমরেড রঘুনাথ দাস।

সমাবেশে উপস্থিত কাকদ্বীপের পানচাষি নারায়ণ দাস, কার্তিক দাস, শতদল বর, সুনীল দাসরা বলে গেলেন, পান চাষিদের উপর ফড়ে এবং এজেন্টেদের জুলুমের কথা। পানচাষিরা হাহাকার করছে। অথচ সরকার কিছুই করছে না। পানকে কৃষি ফসলের স্বীকৃতি দিচ্ছে না। তাঁরা বলেন, বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানি এবং ফড়েদের চক্করে পড়ে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার তরমুজ, লঙ্কা চাষ আজ প্রায় বিলুপ্ত।

বাঁকুড়ার কৃষক নেতা তারাশঙ্কর গোপ জানালের কংসাবতী প্রকল্পের খোয়াব দেখিয়ে একসময় জমি নিয়েছে সরকার। আজ সেই প্রকল্প থেকে চাষিরা কোনও জল পায় না বললেই চলে। ধান ছাড়া অন্য কোনও চাষের উপায় নেই। সেই ধানের দামও ১২০০ থেকে ১৪০০ টাকা কুইন্টালের বেশি পাওয়া যায় না। অথচ এই ধান উৎপাদনে খরচ হয়ে যায় ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকা। সরকারি উদ্যোগে ধান কেনার ব্যবস্থা প্রায় নেই। পশ্চিম বর্ধমানের কোলিয়ারি অঞ্চলে কাজ প্রায় নেই বললেই চলে। সামান্য যা চাষ হয় সেটাই হাজার হাজার মানুষের ভরসা। সেখানকার চাষিরা বলে গেলেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা। কোথায় সেচ, কোথায় সরকারের সাহায্য? পরিযায়ী শ্রমিকের দলে নাম লিখিয়ে কীভাবে দলে দলে মানুষ গ্রাম ছাড়ছেন, বলে গেলেন সে কথা। এমন অসংখ্য অভিজ্ঞতা মাঠ জুড়ে থাকা প্রতিটি মানুষের।

নেতৃবৃন্দের আহ্বান নিয়ে হাজার হাজার কৃষক জেলায় ফিরলেন। শপথ নিয়ে গেলেন, কৃষক জীবনের সমস্যার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন তাঁরা গড়ে তুলবেন।

কমরেড হায়দার চৌধুরী

সাতের পাতার পর

সাংবাদিক বন্ধুরা, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদসৃষ্ট আত্মকেন্দ্রিকতা-ব্যক্তিবাদ-ভোগবাদের তীব্র সাংস্কৃতিক আক্রমণের এই যুগে যৌথস্বার্থ-যৌথ চেতনার ভিত্তিতে একটি সঠিক কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা একটি কঠিন ও কষ্টকর সংগ্রাম। এ পথ সংকটবিহীন নয়, কিন্তু এটাই প্রকৃত পথ, এই বিশ্বাসেই আমরা চলি। চলার পথে বহুরকম সংকট আমাদের মোকাবেলা করতে হয়। রাষ্ট্রের আক্রমণ যেমন আছে, তেমনি দল গড়ে তোলার জটিল সংগ্রামের পথে হাঁটতে না পেরে পিছিয়ে পড়া, হতাশা-বিভ্রান্তি-বিক্ষুব্ধতার সমস্যাও থাকে। তবে সবকিছুর পরও আমাদের পার্টির মধ্যে একদল সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মী গড়ে উঠছে, যারা সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে জীবন নিবেদন করছে। যাদের বহিষ্কার করতে আমরা বাধ্য হয়েছি, সেই নেতা-কর্মীদের আমাদের ত্যাগ করতে হল ও তাতে আমাদের সাংগঠনিক ক্ষতি কিছুটা তো হলই। কিন্তু এ বেদনাদায়ক ঘটনা আদর্শগত, সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়ে গেল। আমাদের নেতা-কর্মীরা সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে জনগণের মুক্তির লড়াইয়ে ভূমিকা রাখার সংগ্রাম চালিয়ে যাবে— দেশের শোষিত-নিপীড়িত মানুষের কাছে দৃঢ়তার সাথে আমরা সেই অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে চাই। এ দেশের শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করতে আমাদের পার্টি বাসদ (মার্কসবাদী)-কে সমস্তরকম সহায়তা প্রদানের জন্যও আমরা জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুবিনুল হায়দায় চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেডস আলমগীর হোসেন দুলাল, মানস নন্দী, উজ্জ্বল রায় ও ফকরুদ্দিন কবির আতিক।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com